Rs. 2.00

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মূল্য ঃ ২ টাকা

মাসিক

Vol : X Issue : I, 15th, April, 2021 চৈত্র, ১৪২৭, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়॥

আজ যদি ধৃতরাষ্ট্র এই প্রশ্ন সঞ্জয়কে করতেন তিনি নিশ্চয়ই লজ্জায়, অপমানে (নির্বাচনী) যুদ্ধের ধারাবিবরণী দিতে পারতেন না। অকথা, কুকথা এবং অবান্তর-কথায় বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত। একদল দেশের সম্পদ (সঞ্চিত এবং প্রাকৃতিক) বিক্রি করতে এবং দেশটাকে হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করতে ব্যস্ত, আর একদল সরকারি টাকা নয়ছয় করে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। এরা পরস্পরকে যে ভাষায় ও ভঙ্গীতে আক্রমণ করছে তা অষ্টাদশ শতকের খিস্তি-খেউরকেও হার মানাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার কথা কেউ বলছে না। যা নিয়ে ভাবা দরকার, কথা বলা দরকার, রাজনৈতিক সংগ্রাম তৈরি করা দরকার, সেই মৌলিক বিষয়গুলি ক্রমশই এই কদর্য নির্বাচনী তাণ্ডবে হারিয়ে যাচ্ছে। আশার কথা, এই কোলাহলের মধ্যেও কিছু শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, যারা আমআদমির যথার্থ দাবীদাওয়াগুলিকে তুলে আনছেন।এখন অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় নয়। সহযোদ্ধার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের সময়। প্রকৃত বন্ধুকে চিনে নেওয়ার সময়।

ভালো থাকুন। করোনা ফিরে আসছে, নিয়ম মেনে চলুন।

"জাগবার দিন আজ"

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি পেনশনার্স সমিতির মুখপত্র 'প্রবীণ কণ্ঠ'-এ প্রকাশিত (মার্চ, ২০২১) লেখাটি পুণর্মুদ্রিত হল। লেখাটির বক্তব্য পুরোপুরি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি পেনশনার্স সমিতির এবং কোনো দায় সম্পাদকমণ্ডলীর নয়।

রাজ্যের সপ্তদশ বিধানসভার নির্বাচন প্রত্যাসন্ন। এই নির্বাচনে পশ্চিমবাংলার অধিবাসীদের আগামী পাঁচ বছরের জন্য রাজ্যের শাসনকর্তৃত্ব অর্পণ করতে হবে কোনো রাজনৈতিক দলের হাতে।

আমরা রজ্যের অধিবাসী। রাজ্য প্রশাসনের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ। নিজেদের স্বার্থ ও কল্যাণের দিকে চোখ রেখেই এই নির্বাচনে আমাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে।

ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য, এখন দিল্লির দরবারে আসীন আরএসএস পরিচালিত বিজেপি। অন্ধ হিন্দুত্ববাদের নামে যারা অন্যান্য ধর্মমতের অনুগামীদের ভারত থেকে বিতাড়িত করতে চায়, অথবা তাদের নিশ্চিহ্ন করতে একান্তভাবেই আগ্রহী। মুসলমানদের এদেশে বাস করতে হবে অবশ্যই হিন্দুদের প্রভুত্ব মেনে, তাদের পায়ের নীচে বাস করতে হবে — এই তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রায়

৫০০ বছরের পুরাতন সৌধ বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে, সুপ্রিমকোর্টের অনুমোদন নিয়ে রামমন্দির প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ৫ আগস্ট ২০২০ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। রাষ্ট্রপতি ৫ লক্ষ টাকা মন্দির নির্মাণে দান করেছেন। জোর করে মন্দির নির্মাণে মানুষের কাছ থেকে চাঁদা আদায় হচ্ছে। কোনো বিবেকবান মানুষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এটা কী করে সম্ভব তা বুঝে উঠতে পারেন না। মন্দির কোন বেকারের কাজ দেবে বা কোন ক্ষুধার্তকে অন্ন দেবে তা কেউ জানে না।

শুধুমাত্র ধর্মীয় অন্ধতা নয়, কর্পোরেট পুঁজির দালালি করে পুরো দেশটাকেই এরা দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে স্বনির্ভরতার আওয়াজ তুলে উপহার দিচ্ছে।

করোনার মারণযজ্ঞে সারা দেশ যখন বিপন্ন, সেই অনিশ্চিত জীবনযাপনের মধ্যে শ্রম আইনের বিলোপ ঘটিয়ে চারটি শ্রম কোডের মধ্য দিয়ে সমস্ত অধিকারকে এরা কবরে পাঠিয়েছে। কাজের ঘণ্টা, শ্রমিকের স্থায়িত্ব, যথেচ্ছ ছাঁটাই এসবই মালিকের ইচ্ছাধীন। প্রয়োজনভিত্তিক বেতনের দাবি উচ্চারণের অধিকারও শ্রমিকের আজ আর নেই।

কৃষিক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নীতি চালু করা হচ্ছে। চুক্তিচাষ আর দাদন প্রথা চালু করা হবে। উৎপন্ন পণ্যের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণে সরকারের কোনো দায়িত্ব থাকবে না। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছে কৃষিপণ্য বিক্রি করবে চাষি। একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর তালিকা ও নিয়ন্ত্রণ বাতিল। প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির নীলচাষিদের অবস্থানে চাষিদের ছুঁড়ে দিয়ে মৃত্যুপরোয়ানা জারি করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, চাষিদের স্বার্থেই নাকি এইসব। আড়াই মাসের বেশি সময় ধরে দিল্লির উপকণ্ঠ ঘিরে রেখে কোটি কোটি কৃষক তীব্র শীতকে উপেক্ষা করে ঐতিহাসিক সংগ্রামে রত। এর মধ্যে ২৫০ জনের বেশি কৃষক শহিদ হয়েছেন। তবু বিরাম নেই সংগ্রামে। দাবি — নয়া তিন কৃষি আইন বাতিল করতেই হবে। নতুবা লড়াই চলবেই।

করোনার আবহে অপ্রস্তুতভাবে 'লকডাউন' ঘোষণা করে কোটি কোটি শ্রমিক, সাধারণ মানুষকে বিপন্ন করা হল। ভিন রাজ্যে অবস্থিত শ্রমিকের ঘরে ফেরার কোনো ব্যবস্থা নেই। কাজ নেই, খাদ্য নেই। মৃত্যুর দুয়ারে রুদ্ধ পরিযায়ী শ্রমিক, অনেক আন্দোলনে যদি-বা কয়েকটি "শ্রমিক স্পেশাল" ট্রেন পেলেন, কিন্তু তাতে থাকল না খাদ্য বা জলের ব্যবস্থা। পায়ে হেঁটে, নানাভাবে গৃহে ফেরার পথে মারা পড়েছেন অনেকে। সরকার দর্শকমাত্র। ১৫ কোটি শ্রমিক এ আবহে কর্মচ্যুত হলেন। কী হবে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের? মৃত্যুর নীরব সমুদ্রেই কি তাঁরা স্তব্ধ হয়ে যাবেন?

মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধির দানবীয় সন্ত্রাসে আক্রান্ত জনগণ। জ্বালানির দাম বাড়ানো হচ্ছে প্রতিদিন। অবাধ লুটের বহর বেড়ে চলেছে মুহুর্মুহু। ভারতের মানুষ আজ অসহায়, কিন্তু মুকেশ আম্বানি, আদানিদের সুপারসনিক জেটের গতিতে মুনাফা বেড়ে চলেছে। এর মধ্যে চলছে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিলগ্নির উৎসব। সবই হল কর্পোরেটের সেবায় উপহার। হায় ভারতবাসী! তোমাদের চেতনার উদয় হবে কবে! মৃত্যুর দুয়ারে বসে, পরাধীনতার দাসত্বে

ডুবে বিজেপির ভজনা কি করতে পারে কোনো ভারতবাসী!

বাংলায় শুরু হয়েছে আজ এক সার্কাস। তৃণমূল কংগ্রেসের মা-মাটি-মানুষের সরকার, মায়ের নামে বাংলাকে বলি দিচ্ছে। শিল্পের ভবিষ্যৎকে মাটি করে ছেড়েছে; আর মানুষকে করে তুলতে চাইছে চোর-জোচ্চোর-বাটপাড় আর লুটেরা-ডাকাত। মৃত্যুর দুয়ারে বসে বাংলার মানুষ আজ আতঙ্কিত। দীর্ঘ সংগ্রামের পথে বাংলার মানুষ প্রতিষ্ঠা করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। তারা বাংলাকে দিয়েছিল স্বস্তি, শান্তি, সমৃদ্ধি। রাজ্য ধান উৎপাদনে প্রথম; শিক্ষার অবাধ বিস্তৃতি, সকলের জন্য শিক্ষা; বেকারদের চাকরি; বেকারভাতা; বন্ধ কলকারখানার মজুরদের ভাতা প্রদান; শ্রমিকের অধিকার; কৃষকের জীবনে সুরাহা; কর্মচারীদের জন্য পরপর চারটি বেতন কমিশন; কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা; পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি — জনকল্যাণের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল বাংলায়। ২০১১ সালে বামফ্রন্ট সরকার অবলুপ্ত হল। অভিশপ্ত বাংলার বিকাশ স্তব্ধ হয়ে শুরু হল সর্বক্ষেত্রে অধোগতি। বেকারত্বের অভিশাপে মৃত্যুপথযাত্রী বাংলার যৌবন প্রতিবাদের পথে। পুলিশি নির্মমতায় জীবন দিল উজ্জ্বল সমাজসেবী তরুণ মইদুল ইসলাম। রাজ্য দপ্তরে নিয়োগ বন্ধ, যেটুকু হয় তাও স্বজনপোষণ। বিদ্যালয়ে শিক্ষক নেই, পার্শ্বশিক্ষকেরা বসে আছেন পথে, দীর্ঘদিন ধরে। মহার্ঘভাতা ভুলে গেছে কর্মচারী। নির্বাচনের মুখে ২১ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রাপ্য হলেও উপেক্ষার বার্তায় ৩ শতাংশ।

এখন আবার চাই বাংলার বুকে উন্নত চেতনা। সে সমাজবোধ, প্রগতি আন্দোলনের গতি; সমস্ত কলুষকে মুক্ত করে বাংলাকে আবার সমাজতান্ত্রিক চেতনার ধারক বামপন্থীদের অগ্রগতির পথে পরিচালিত করবে। সেই সাফল্যের ভিত্তিই প্রতিষ্ঠিত হোক আসন্ন নির্বাচনে। জয়ী করুন বামফ্রন্টকে ও তাদের সহযোগীদের। পরাস্ত করুন জনগণের শত্রু বিজেপি আর তৃণমূল কংগ্রেসকে।

চিমনি থেকে ম্যানহোল

গৌতম রায়চৌধুরী

When my mother died I was very young,
And my father sold me while yet my tongue
Could scarcely cry "Weep!' 'Weep!' 'Weep!' 'Weep!"
So your chimneys I sweep & in soot I sleep.

"দ্য চিমনি সুইপার"— ব্রিটিশ কবি উইলিয়ম ব্লেকের একটি বিখ্যাত কবিতা। দুটি ভাগে প্রকাশিত হয় ১৭৮৯ এবং ১৭৯৪ সালে, তৎকালীন ব্রিটেনের বীভৎস শিশুশ্রমের বর্ণনা দিয়ে। শৈশবে মাতৃহীন শিশুটিকে হতদরিদ্র বাবা বিক্রি করে দিয়েছেন কারখানার মালিকের কাছে। আধুনিক শিল্পের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে। কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের বিশাল সব চিমনি। পরিষ্কার করার জন্য দরকার শিশু শ্রমিকদের। অর্ধনগ্ন শিশুগুলিকে ফেলে দেওয়া হত চিমনির উপর থেকে, ভুসোকালি পরিষ্কার করার জন্য। পড়ে গিয়েই অনেকের মৃত্যু হত। বেশির ভাগই ভুসোকালির রাসায়নিক বিষক্রিয়ায় শৈশবেই মারা যেত। সামান্য কয়েকজন দীর্ঘ জীবন পেত, তবে তাদের সঙ্গী হত শ্বাসজনিত রোগ। অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডের শ্রমজীবি মানুষের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

উনবিংশ শতকের কলকাতা। ভবানীপুরের এক মধ্যবিত্ত পাড়া। ১৯০৭ সালের কোনো একদিন নফরচন্দ্র কুণ্ডু নামক এক ব্যক্তি অফিস যাওয়ার পথে দেখলেন নর্দমার বিষাক্ত গ্যাসে দুজন শ্রমিক ছটপট করছেন। সহৃদয় কুণ্ডুবাবু তাদের উদ্ধারের চেষ্টায় নর্দমায় নামলেন, কিন্তু আর উঠতে পারলেন না। বিষাক্ত গ্যাসে মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ হল এবং জায়গাটার নামকরণ হল 'নফর কুণ্ডু লেন', যা এখনও আছে। কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের বিখ্যাত কবিতা 'নফর কুণ্ডু'-তে তিনি অমর হয়ে আছেন।

২০২১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। কলকাতার কুঁদঘাট। ম্যানহোলে কাজ করতে গিয়ে মারা গেলেন মালদহের হরিশচন্দ্রপুর এলাকার পূর্ব তালসের গ্রাম থেকে কাজ করতে আসা তিন ভাই— মহম্মদ আলমগীর (৩৫), জাহাঙ্গীর আলম (২২) এবং সাবির হোসেন (২০) ও তাদের প্রতিবেশী লিয়াকত আলি (২০)। এরা সবাই একটি ঠিকাদারি সংস্থার হয়ে কাজ করত। সুতরাং কলকাতা পুরসভার কোনো দায়িত্ব নেই। তাদের নিযুক্ত তদন্ত কমিটি গত ৩১ মার্চ, ২০২১ তারিখে জানিয়েছেন যে ওই শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এমনকি কোনও সুরক্ষা-কবচ ছাড়াই তারা ম্যানহোলে নেমেছিল। তদন্ত কমিটি ঠিকাদার সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করার সুপারিশ করেছে।

তিনশো বছরের বেশি সময় ধরে শ্রমিকরা অবহেলিতা, অত্যাচারিত। শিল্প বিপ্লব, সর্বোপরি ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে ইউরোপের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের অবস্থা তথৈবচ। ১৯০৭-এর নফর চন্দ্র কুণ্ডু থেকে ২০২১-এর আলমগীর ভাইরা— 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে বয়ে চলেছে।' অবস্থার উন্নতির বদলে অবনতি হয়েছে। এই মৃত্যুর পিছনে যে নির্মম অবহেলা তা নিয়ে পবিত্র ক্রোধ বা হা-হুতাশের কোনো অর্থ নেই। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আমরা শহুরে মধ্যবিত্তরা আবারও জানতে পারি নিকাশি নালায় কাজে নামার আগে নানাবিধ নিরাপত্তা থাকা দরকার, যেমন গ্যাসমাস্ক, জমা জল বার করার জন্য পাম্প, অক্সিজেন চলাচলের জন্য ফ্যান, বাতাস পরীক্ষা করার জন্য 'এক্সপ্লোসিভ মিটার', অক্সিজেন সিলিণ্ডার, দড়ি, সর্বোপরি পুরসভার কর্মী, ঠিকাদার এবং নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি। হতভাগ্যদের কোমরের দড়িটুকু পর্যন্ত জোটে নি। কলকাতা পুরসভা, তদন্ত কমিটি নিয়োগ করে এবং পাঁচ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দিয়েই দায়িত্ব পালন করেছে। কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সেই 'পাঁচ লক্ষ' টাকা ঠিকাদার ফেরৎ দেবে পুরসভাকে। চারটি তাজা প্রাণ এভাবে চলে গেল কেন; সেটা কোনো প্রশ্নই নয়। আরও কেন যায় না, সেটাই বিস্ময়ের।

এই অবহেলার উল্টো দিকে আছে গরীব মানুষগুলির অসহায়তা। গ্রামে কাজ নেই, অতিমারীর ভয়ে অন্য রাজ্যে যাওয়া বন্ধ, ফলে একমাত্র ভরসা— কলকাতা। কিন্তু এখানে কাজের কোনো ঠিকঠিকানা নেই। অভিজ্ঞতা নেই, তাই যা পায় তাই করে। মজুরির বাঁধাধরা নিয়ম নেই। থাকলেও হাতে পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। যখন যা পায় বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। মোবাইলে মাঝে মাঝে ফোন করতে পারে। ২৫ ফেব্রুয়ারি আলমগীর নালায় নামার আগে বাড়িতে ফোন করেছিলেন, লিয়াকত তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর শরীরের খবর নিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পরই পরিবার জানতে পেরেছিল তাঁরা কী কাজ করত। এটা কিন্তু ব্যতিক্রম নয়, এটাই নিয়ম। গত বছর,

করোনা-লকডাউনের সময় আমরা পরিযায়ীদের লঙমার্চ দেখে শিহরিত হয়েছিলাম।

পরিযায়ী শ্রমিকরা যখন হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত রেললাইনে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ধাবমান ট্রেনের শব্দও শুনতে পায় নি। অসহায় হয়ে মৃত্যু বরণ করেছিল বা হাইওয়েতে হাঁটতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়েছিল, তখন রাষ্ট্র তাদেরই দোষী সাব্যস্ত করেছিল। কারণ রেললাইন বা 'ন্যাশনাল হাইওয়ে' গুলিতে হাঁটা আইনত নিষিদ্ধ। তেমনি ম্যানহোলে বিষাক্ত গ্যাসে মৃত আলমগীরদের হয়তো, সুরক্ষা বিধি অমান্য করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হবে। আদালত তো আইনের উর্দ্ধে যেতে পারবে না এবং আদালতের বিরুদ্ধে কিছু বলাও যাবে না।

মানুষ বিপর্যয় থেকেই শিক্ষা নেয়। ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দেয়। আমাদের দেশের রাষ্ট্রনায়করা, কেন্দ্র, রাজ্য নির্বিশেষে, সে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত যে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবি মানুষের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা নেই, কাজের সুস্থ নিরাপদ পরিবেশ ও পরিকাঠামো নেই, তাদের জন্য কোনো ভাবনা কী চোখে পড়ে? এককথায় উত্তর—না। উপরন্তু অতিমারীর সুযোগে পুরোপুরি বিপরীত লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবি মানুষের জন্য যে সামান্য সুযোগ-সুবিধাগুলি ব্রিটিশ আমল থেকে চালু ছিল, শ্রম আইন 'সংস্কার'-এর জন্য বিল করিয়ে, তাও তুলে দেবার আয়োজন করা হয়েছে। সংগঠিত ক্ষেত্রে অল্পসংখ্যক শ্রমিকের জীবিকার যেটুকু নিরাপত্তা এখনও আছে, কর্মস্থলে স্বাস্থ্যহানি বা দুর্ঘটনা নিবারণের যেটুকু ব্যবস্থা আছে, সেটা চালু রাখার যেটুকু আইনী বাধ্যবাধকতা আছে, নব সংস্কারের ফলে বরবাদ হয়ে যাবে। 'অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশনস' আইনটি আগে যে সংস্থায় কর্মীর সংখ্যা ১০ (বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে) বা ২০-র (বিদ্যুৎ ব্যবহার না করলে) কম, সেখানে প্রযোজ্য হত না। এই সীমারেখা যুক্তিহীন, সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হওয়া উচিত। কিন্তু নতুন সংস্করণে সীমা কমানোর পরিবর্তে কর্মী-সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয়েছে যথাক্রমে ২০ ও ৪০। অর্থাৎ আরও বহু সংস্থা এখন আর বাধ্য থাকবে না। আইন থাকাকালীনই অধিকাংশ মালিক নিরাপত্তা বিধানের শর্তাবলী বেমালুম অস্বীকার করে, আর এখন তো পোয়াবারো। বোঝার উপর শাকের আঁটি, কোনো রাজ্যসরকার কর্মসংস্থান বৃদ্ধির স্বার্থে যে কোনো নতুন কারখানাকে এই আইন থেকে অব্যাহতি দিতে পারবে। সর্বোপরি, যে 'মে দিবস' সারা বিশ্বের শ্রমিকদের কাছে এক পবিত্র দিন হিসাবে পালিত হয়, তার তাৎপর্যটাও এই শ্রম-সংস্কারে হারিয়ে যেতে বসেছে। নতুন শ্রমবিধিতে মালিকরা ইচ্ছা করলেই ১২ ঘণ্টা অবধি কাজ করাতে পারবেন।

উদার (?) অর্থনীতির প্রবক্তারা মনে করেন শ্রমের বাজার থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিলে বিনিয়োগ বাড়বে, শিল্পের প্রসার হবে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদেরও আয় বৃদ্ধি পাবে। আমাদের মহান নেতা মোদিজী এবং তাঁর সভাসদরা এই মতে বিশ্বাসী। তবে এই বিনিয়ন্ত্রণ অর্থনীতির প্রসার ঘটায় এমন কোনো তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। যদি তর্কের খাতিরে এই অদ্ভুত সমীকরণটা মেনেও নিই, তবুও শ্রমিকের প্রাণের বিনিময়ের এই উন্নয়ন কী কাম্য হতে পারে। আমাদের মন্ত্র 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ'। কোথায় রইল সবার বিকাশ? এ তো উন্নয়নের গাজর দেখিয়ে পুঁজির হাতে সব কিছু তুলে দেওয়া। আমরা সবাই ''গাধা'' আমাদের এই নতুন রাজত্বে।

হ্যাঁ এটাই তাঁরা, কৃষি, শিল্প বা সেবা সবক্ষেত্রেই করছেন বা করতে চাইছেন। সারা ভারতের মিডিয়া ভয়ে বা লোভে তাদের কাছে মাথা মুড়িয়েছে। তাহলে উপায়? একমাত্র শ্রমজীবি মানুষ ও কৃষকের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ, সংগঠিত রাজনীতিই পারে এই সর্বনাশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। ক্রীতদাস প্রথা থেকে বর্তমানে শ্রমিক-কৃষকের অবস্থার উন্নতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই মতবাদের সত্যতা বোঝা যায়। অনেকেই হয়তো আমাদের দেশে গত শতাব্দীর লাগামছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কথা উল্লেখ করবেন। শ্রমিকরা নিজেদের দাবী আদায়ে যতটা সচেষ্ট ছিলেন, হয়তো সর্বদা দায়িত্ব পালনে ততটা ছিলেন না। অনেকেই বিশ্বাস করতেন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনই শিল্পের ধ্বংসের মূল কারণ। কিন্তু কালের নিরিখে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে, মাথার উপর থেকে ছাতা সরে গেলে যেমন রোদের তেজ বোঝা যায় ট্রেড ইউনিয়ন দুর্বল হওয়ার পর বোঝা যাচ্ছে তার প্রয়োজনীয়তা। তাই একমাত্র সংগঠিত শ্রম-আন্দোলনই মুক্তির উপায়। নির্বাচনী প্রচারের নামে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে যে ভূতের নৃত্য চলছে, তাতে মৌলিক প্রশ্নগুলি ক্রমাগত হারিয়ে যাচ্ছে। জাত-ধর্ম-বহিরাগত প্রভৃতি অলীক-অবাস্তব ইস্যুতে কদর্য ভাষায় দুটি প্রধান প্রতিপক্ষ চীৎকার করে চলেছে। এরই মধ্যে জীবন-জীবিকা নিয়ে, মৌলিক প্রশ্নগুলি যারা তুলছে তাঁদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমকে ছোট করলে মস্ত অন্যায় হবে। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগ্রামের পথই একমাত্র উপায়। তাই হতাশা নয়, অন্ধকারের মধ্যেও নানা নতুন সম্ভাবনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের সময়।

২৬ ফেব্রুয়ারি তিন সন্তানের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তোরাব আলির প্রশ্ন ছিল, "তিন ছেলেকে হারিয়ে আমরা কী নিয়ে বাঁচব?" এই প্রশ্নের উত্তর হয় না। তবে ভবিষ্যতে তোরাব আলিদের যেন এই প্রশ্ন না করতে হয় সেটাই এই লড়াইয়ের লক্ষ্য।

কীভাবে চোখের যত্ন নেবেন

ডাঃ প্রতীপরঞ্জন ঘোষাল

ভালো কথা বললে, ভালো বুদ্ধি দিলে নাও না কেন ভাই? তোমাকে অনেকবার বলেছি, কাজটা কম্পোজিশান ও প্রিন্টিংয়ের। ভীষণ চাপ পড়ে চোখের ওপর। যা করবে, চশমাটা পরে করো, আর চশমার লেন্সদুটো অন্তত অ্যান্টি-রিফ্লেকশন কোটিং করে নাও। এতে চোখ দুটো অনেকটাই বাঁচবে।

—এই যে ডাক্তারবাবু, হঠাৎ রেগে গেলেন কেন? দময়ন্তী ঢুকলো ঘরে। ও, অনুপবাবুকে! হাঃ হাঃ— তা, কী নিয়ে লাগলো? আরে দ্যাখ না, বারবার বলেছি তোমার চোখ দুটো বেশ খানিকটা খারাপ আর কাজটাও কম্পোজিশান ও প্রিন্টিংয়ের। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজ। প্লিজ চশমাটা ব্যবহার করো। আর লেন্স দু'টোকে 'এ আর সি' করিয়ে নাও। তাতে খানিকটা অন্তত বাঁচবে চোখ দু'টো। তারপর একনাগাড়ে কম্পউটার মনিটারের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় অনেকক্ষণ ধরে। একটা ইনভিসিবল-রে বেরোয় ওই মনিটর থেকে যা চোখের নার্ভস ও রেটিনার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। দীর্ঘদিন এই 'রে' এক্সপোজার চোখে লাগলে 'কম্পিউটার আর সিনড্রোম' জাতীয় চোখের একটা অসুখ সৃষ্টি হয়। যা আজকাল প্রায়শই দেখা যাচ্ছে। আই টি ও কর্পোরেট সেক্টরের ছেলেমেয়েদের এমন উপসর্গ

দেখা যাচ্ছে, একটা জ্বালা-জ্বালা ভাব থাকছে। মাথা ব্যথা হচ্ছে। চোখ শুকনো লাগছে।

—তাই নাকি? দময়ন্তী এটা ইয়ার্কি মেরে সম্বোধন করে। হ্যাঁ তাই-ই। তাহলে এর প্রতিকার কী? কাজের ফাঁকে-ফাঁকে মাঝে-মাঝে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল দিয়ে চোখ দুটো ধুয়ে ফেলতে হবে। মনিটারের ব্রাইটনেসটা যতটা সম্ভব কমিয়ে দিয়ে কাজ করতে হবে। যাঁদের চোখে পাওয়ার আছে তাঁরা পাওয়ার চশমায় এ আর সি করিয়ে নেবে। যাঁরা কণ্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করেন তাঁরা একটা জিরো পাওয়ারের এ আর সি চশমা পরে কাজ করবে। আর যাঁদের চোখে কোনও পাওয়ার নেই তাঁরাও প্লেন এ আর সি চশমা পরে কাজ করবে। এছাড়া নাগাড়ে বেশিক্ষণ মনিটারের সামনে তাকিয়ে থাকা চলবে না। চোখকে একটু বিশ্রাম দিতে হবে। সবচেয়ে জরুরি যেটা, সেটা হলো নিয়মিত এক বা দু'বার কোনও লুব্রিক্যাণ্ট জাতীয় আইড্রপ একফোঁটা করে দিতে হবে। এতে চোখের ওপর পড়া সারাদিনের স্ট্রেইনটা কেটে যাবে ও চোখে দু'টো আরাম পাবে।

অনেকেরই জানা নেই, গরমে গরম পানীয়, আর শীতে ঠাণ্ডা পানীয় খাওয়াটাই বিজ্ঞানসম্মত। এই গরমে কী করে চোখ ভালো রাখবো? শোনো— এই কাটফাটা গরমে রোদের ঝলকানির হাত থেকে বাঁচতে হলে ইউ ভি প্রোটেকটেও সানগ্লাস ব্যবহার করতে হবে। যতবার পারো পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল দিয়ে চোখ দুটো ধুয়ে ফেলো. কাজল-সুরমা-লাইনার জাতীয় জিনিস যতটা পারবে কম ব্যবহার করবে। কারণ, ওগুলো যত দামি কোম্পানিরই হোক না কেন, মূল উপাদান কার্বন যেটা চোখের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। টুপি বা ছাতা ব্যবহার করবে যাতে সরাসরি সূর্যরশ্মিটা চোখে না পড়তে পারে। কচি শসাকে ফালি-ফালি করে কেটে চোখের ওপরে প্যাডের মতো লাগিয়ে রাখবে কিছুক্ষণ। টকদই খাবে নিয়মিত। এতে শরীরের সঙ্গে চোখও ঠাণ্ডা থাকবে। আর নিয়মিত শোবার আগে পরিষ্কার জল দিয়ে চোখমুখ ধুয়ে লুব্রিকেটিং আই ড্রাপ একফোঁটা করে লাগিয়ে দেবে চোখে।

আমাদের কলকাতা মেট্রোপলিটন শহরে ধুলো-ধোঁয়ার প্রকোপ অনেক বেশি। প্রতিনিয়তই সেগুলো আমাদের চোখে এসে পড়ছে এবং বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করছে। চোখ জ্বালা করা, চোখ চুলকানো, চোখ দিয়ে জল পড়া, চোখ লাল হওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন রকম সমস্যা প্রতি মুহূর্তেই ফেস করতে হয় আমাদের।

এবার বলি এগুলো প্রতিকারের উপায় কী?

ওকে ফাইন, এবার শোনো চোখের সাধারণ যত্ন। প্রতিদিন আমরা সকলবেলা ঘুম থেকে উঠে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল দিয়ে আলতোভাবে চোখ ধুয়ে ফেলবো। জোরে জলের ঝাপটা দেবো না চোখে, কারণ চোখের শিরা-উপশিরা ও নার্ভসগুলো খুবই সূক্ষ্ম। জোরে জলের আঘাতেও ওগুলোর ক্ষতি হতে পারে বা ছিঁড়ে যেতে পরে। কড়া রোদে আমরা রোদচশমা ব্যবহার করবো। আর যাঁদের চোখে পাওয়ার আছে তাঁরাও পাওয়ার কাচে 'বিহ' জাতীয় পাওয়ার কাচ বা রঙিন ফাইবার লেন্স বানিয়ে নিয়ে পড়বে ডাইরেক্ট সূর্যরশ্মি এড়ানোর জন্য। এছাড়াও সারাদিন অফিস বা স্কুল-কলেজে মাঝে-মাঝেই পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল দিয়ে চোখ দু'টো ধুয়ে ফেলা উচিত।

যেসব মেয়েরা প্রতিদিন কাজল-সুরমা-লাইনার-মাস্কারা জাতীয় রঞ্জক পদার্থ ব্যবহার

করেন চোখের হাইলাইটার হিসেবে, তাঁদের ওইসব কসমেটিক ব্যবহার কমাতে হবে বা বন্ধ করতে হবে চোখ ভালো রাখার জন্য। মোবাইল বা ট্যাব-এ একনাগাড়ে নেট করা চলবে না। এতে চোখের ওপর ভীষণরকমের ট্রেস ও চাপ পড়ে। যাঁদের কম্পিউটার সম্বন্ধীয় জব বা পড়াশোনা, তাঁদের মাঝে-মাঝে কাজের ফাঁকে-ফাঁকে চোখকে বিশ্রাম দিতে হবে যাতে চেখের নার্ভস ও মাস্‌লগুলো ফ্যাটি না হয়ে যায়। সারাদিনের ধুলোময়লা ও পলিউশন থেকে চোখকে বাঁচাতে প্রতিদিন অন্তত একবার শোবার আগে চোখ ভালো করে ধুয়ে নিয়ে লুব্রিকেটিং জাতীয় আই ড্রপ লাগাতে হবে চোখে। অ্যানিমেল প্রোটিনটাও চোখের জন্য উপকারী। আর উপকারী সবুজ শাকসবজি। গাজরের উপকার বিশ্ববন্দিত চোখের জন্য।

ইতিহাসের দর্শন

তপন কুমার দাস

মানুষের সামগ্রিক অতীত ঘটনার লিপিকৃত রূপই ইতিহাস। অতীতকে জানা, উপলব্ধি করা, কার্য-কারণ সম্বন্ধ নিরূপণ করা, তার সাথে বর্তমানের সাদৃশ্য খোঁজা এবং অতীত থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করার জন্য ইতিহাস বাদে অন্য কোন আশ্রয় নেই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন ইতিহাস না জানলে ভবিষ্যতের পথে এগোনো সম্ভব নয়। ইতিহাস মানব-জ্ঞানের অতি প্রয়োজনীয় অংশ, সাথে সাথে অতি চমকপ্রদও। অতীতকে জানা এজন্য অপরিহার্য যে, মানুষ যেমন অজানা ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতে কৌতূহলী হয় ঠিক তেমন ভাবেই অতীতের কথা জানবার আগ্রহও তার কম নয়। আর কেনই-বা তা না হবে? জ্ঞানের যে শাখা মানুষের প্রাচীনতম ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম, মূল্যবোধ, ঐক্য-অনৈক্য, সংঘাত-সংঘর্ষ, শান্তি কিংবা বিবর্তনের কথা অবিচ্ছিন্নতাকে জানিয়ে যাচ্ছে তার গুরুত্ব তো সবার উপরে। কল্পনাশক্তিকে সমৃদ্ধ ও অনুভবক্ষমতাকে বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে ইতিহাস পাঠের বিকল্প নেই। ইতিহাস অতীত-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য মানুষকে নিরবচ্ছিন্নভাবে যোগান দিয়ে যায়। এটা অত্যন্ত সুখের কথা যে, ইতিহাসের গণ্ডি অতীতের যে-কোনো সময় থেকে বর্তমানে অনেক বেশি সম্প্রসারিত। বর্তমানে ইতিহাস মানে রাজ-রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহ আর জয়-পরাজয়ের কাহিনি। ইতিহাস দর্শনের প্রেক্ষাপটে মানুষের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরেও রয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, কৃষি-শিল্প-শিক্ষা কিংবা বিজ্ঞান ও দর্শনের বিস্তৃত ক্ষেত্র। সুতরাং ইতিহাস বললে খুব সঙ্গত কারণেই এসব কর্মধারার সামগ্রিক বিষয়গুলো চোখের সামনে হাজির হয়। আর ইতিহাসের দর্শন এই বিরাট কর্মযজ্ঞের চুলচেরা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার সর্বপ্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন। বস্তুত ইতিহাসের রচনাপদ্ধতি, তার বিষয়বস্তু নির্বাচন, অসংখ্য তথ্য-উপাত্ত থেকে বাছাই, সেগুলোকে লক্ষ পূরণে সঠিকভাবে ব্যবহার এবং বর্ণনার আঙ্গিকের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে ইতিহাসের দর্শন। আবার অনেকে মনে করেছেন "কাকে বলে ইতিহাস"-এর যথার্থ উত্তর অনুসন্ধানের মধ্যেই ইতিহাসের দার্শনিক মূল্য নিহিত।

১৩ মার্চ ২০২১ ডাঃ নর্মান বেথুনের জন্মবার্ষিকী ও সংস্থার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

প্রতিবেদক - স্নেহাংশু চাকদার

১৩ মার্চ ২০২১ শনিবার বিকাল ৪.৩০ মিনিটে ডাঃ কৃষ্ণা হালদারের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন পেলব মুখার্জী। ১ এপ্রিল ২০২০ হতে ১৩ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত জয়া ইউনিয়নের সদস্যসহ আমাদের যে সকল সদস্যদের জীবনাবসান হয়েছে তাদের তালিকা পাঠ করেন দীপেশ মিত্র এবং তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সভাপতি সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন আরও একটা বছর অতিক্রম করে বেথুন ইন্সটিটিউট এগিয়ে চলেছে। ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আর থেমে থাকতে দেখা যায়নি।

আমাদের কাছে এ সময়ের গুরুত্ব অনেকটাই। ২ মার্চ আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জী ও ২২ মার্চ জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় হরিদাস মালাকার-এর প্রয়াণ দিবস। এ উপলক্ষে আগামী ২৩ মার্চ স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। আশা করি আপনারা সকলে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন। আজ ১৩ মার্চ ডাঃ বেথুনের জন্মদিন এবং বেথুন ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা গেলেও, অন্যান্য অনুষ্ঠান আমরা পালন করতে পারিনি COVID-19-এর কারণে সরকারি নির্দেশে রোগ প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হবার কারণে। বছর কেটে গেলেও করোনা চলছে বীর বিক্রমে, কবে এর শেষ হবে জানা নেই। করোনার আক্রমণে জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। স্কুল-কলেজের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে নি। আদালতও প্রায় বন্ধ। এরকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যেও আমাদের চলতে হয়েছে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে।

আমাদের লড়াই কিন্তু থেমে থাকেনি। রিলিফ বিতরণ করেছি। প্রবীণবার্তা প্রকাশ করতে পেরেছি। ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠান ও বাৎসরিক পিকনিকও অনুষ্ঠিত হয়েছে। সামনে নির্বাচন। আপনাদের ভোটে আগামী ৫ বছরের জন্য রাজ্যের ক্ষমতা কাদের হাতে যাবে তা নির্ধারিত হবে।

সভায় বক্তব্য রাখেন গৌতম রায়চৌধুরী। তিনি বলেন ডাঃ হেনরী নর্মান বেথুন চিকিৎসা বিজ্ঞানকে পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। ডাঃ হেনরী নর্মান বেথুনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০০৫ সাল থেকে আমরা প্রবীণদের কল্যাণে কাজ করে আসছি। বেথুনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বর্ণনা করে চিকিৎসা ব্যবস্থার যে কাজ আমরা করে যাচ্ছি তার ব্যাখ্যা করেন। সারা বছরই আমরা প্রবীণদের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি। কিন্তু বিগত ২০২০ সালে মার্চ মাসের পর থেকে COVID-19-এর কারণে কোন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তার মধ্যেও মে মাসে বেঙ্গল ল্যাম্প এলাকায় ত্রাণ বিতরণের কাজ আমরা করেছি। এপ্রিল ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০-এর প্রবীণবার্তা যথাসময়ে প্রকাশ করতে না পারলেও তা নভেম্বর মাসের মধ্যে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের ক্লিনিকে ফিজিওথেরাপী, আকুপাংচারসহ হোমিও চিকিৎসা যথারীতি চলছে। কিন্তু এ্যালোপ্যাথি ডাক্তার এখনও বসছেন না। বয়স্ক নিঃসঙ্গ মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে

যাচ্ছি। এখানে আমরা যারা আছি ১-২ জন ছাড়া আমাদের পক্ষে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে কাজ করা সম্ভব নয়। তাই আমরা চেষ্টা করছি অল্প বয়স্ক লোকদের আমাদের সাথে যুক্ত করে যাতে দুঃস্থ, নিঃসঙ্গ, বয়স্ক লোকদের সাহায্য করতে পারি। আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলে অবশ্যই সফল হতে পারব। প্রতি বছর এইদিনে আমরা এলাকার কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদান করে তাঁরা হলেন— প্রশান্ত কর, অশেষ চৌধুরী, শান্তিপ্রভা রায়।

প্রশান্ত কর-কে উত্তরীয়, পুষ্প-স্তবক, স্মারক প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা জানান সভাপতি পেলব মুখার্জী। তদরূপভাবে অশেষ চৌধুরী-কে সম্মাননা জানান সম্পাদক দীপেশ মিত্র। শান্তিপ্রভা রায়-কে সম্মাননা জানান সহ-সভাপতি মৃণাল দত্ত। সম্মাননা প্রদানের পর তাঁরা সংস্থার কাজের প্রশংসা করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তারপর উর্মিমালা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর আবৃত্তির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরবর্তীতে একে একে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আদিত্য মুখার্জী, ডাঃ কৃষ্ণা হালদার এবং গৌতম রায়চৌধুরী (২)।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গৌতম রায়চৌধুরী।

১ এপ্রিল থেকে ২০২১ - ২০২২ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে। অনতিবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণ ও প্রবীণবার্তার জন্য ৫০/- টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- বিজ্ঞাপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৮ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪
যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস স্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৬-৭টা)

কম খরচে

রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর. সি. সহায়তা ১০ টাকা

১) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধে ৭টা

২) ডঃ বিপ্লব আচার্য এম.এস।
প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা

৩) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার, সন্ধে ৭টা

৪) ডঃ বি. বাউর-এম.ডি. (জেনারেল মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা

৫) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি এম. ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার, ৮টা

৬) ছন্দোলীনা মহামাত্র এম.এ (সাইকোলজি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা

আবেদন ______________

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in